দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 SEP 2015
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৬

উচ্চশিক্ষায় মেয়েরা

অনন্য জহির

কিছু দিন আগেই প্রকাশিত হলো উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ফলাফল। প্রতি বারের মতো এবারেও এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হারে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা এগিয়ে আছে। মোট ১০ লাখ ৬১ হাজার ৬১৪ শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৭ লাখ ৩৮ হাজার ৮৭২ জন। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা হলো ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৫০৯ জন। আর ছাত্রীদের পাসের হার ৭০ দশমিক ২৩ শতাংশ। এখন সময় পুরাতন গণ্ডি পেরিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখার, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করার। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার অবারিত সুযোগের হাতছানি দিয়ে ডাকছে সবাইকে। কিন্তু এইখানেই ঘটে বিপত্তি। উচ্চমাধ্যমিক পাস করা প্রতিটি ছেলে যেমন করে সুযোগ পায় উচ্চশিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে, ঠিক তেমন করে সুযোগ পায় না প্রতিটি মেয়ে। শুধু মেয়ে বলে পরিবার কিংবা পারিপার্শ্বিকতা থেকে চাপ আসে যে, মেয়ে হয়ে আর কত শিক্ষার দরকার? এবার সময় সংসার সামলাবার। তাই আমাদের দেশের অর্ধেকেরও বেশি মেয়ে উচ্চশিক্ষার গণ্ডিতে পদার্পণই করতে পারে না। তার আগেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। বহুদিন আগে একটি প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'আমাদের দেশের নারীর এই অনগ্রসরতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে দুঃখের সঙ্গে লিখেছেন- 'স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনার সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রমালা বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন; স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাল-ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনির গতি নির্ণয় করেন। এই অবস্থার ফলে সমগ্র সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যে শকটের এক চক্র বড় এবং এক চক্র ছোট হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না। সে কেবল একই স্থানে ঘুরিতে থাকিবে। তাই বঙ্গবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।'

তারপরেও যেই স্বল্পসংখ্যক মেয়েরা উচ্চশিক্ষায় পদার্পণের সুযোগ পায়, সেখানেও তাদের মুখোমুখি হতে হয় বিভিন্ন ধরনের বাধার। উচ্চশিক্ষা অর্জনে, বিষয় পছন্দের ক্ষেত্রে পরিবার, আত্মীয় স্বজন এমন কি সমাজও প্রথমেই মনে করিয়ে দেয় যে, 'তুমি মেয়ে। কিভাবে এটা করবা? এতে তো অনেক ঝামেলা।' পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে প্রায়ই একটি মেয়ের অভিভাবককে প্রভাবিত করে বলতে শোনা যায়, 'মেয়েকে এত লেখাপড়া করিয়ে কি হবে? তার চেয়ে বরং বিয়ের জন্য টাকা গোছাও। শেষে তো ওইটাই কাজে আসবে। মেয়ের পড়ার পিছনে এত বাজে খরচ কর না।' এতে করে মেয়েদের অভিভাবকও মেয়েদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে।

এঙ্গেলস তার 'অরিজিন অব দ্য ফামিলি' গ্রন্থে বলছেন, 'নারী মুক্তি তখনই সম্ভব, যখন নারীরা সমাজের প্রতিটা কর্মকাণ্ডে সমগুরুত্ব নিয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।' একটি মেয়েকে যদি যোগ্যতা প্রমাণে পরিপূর্ণ সুযোগই না দেয়া হয়, তাহলে কিভাবে বোঝা যাবে যে, মেয়েটি কিছু করে দেখাতে পারবে কিনা? আমাদের সমাজে প্রায়ই একজন নারী প্রকৌশলী কিংবা আইনবিদকে বলতে শোনা যায়; 'আপনি মেয়ে হয়ে এই পেশা বেছে নিলেন কেন?' অথবা এই পেশার গ্রাহকদের সেবা নিতে গিয়ে শুনতে পাওয়া যায়, 'এরা তো মেয়ে মানুষ? এঁরা কিভাবে এসব সামলাবে?' পেশাদারিত্ব থাকলে যে কেউই যে কোন পেশায়ে তার দক্ষতা প্রমাণ করতে পারে, এটা আমাদের সমাজে এখনও বোধগম্য হয়ে ওঠেনি। সে ক্ষেত্রে মেয়ে কিংবা ছেলে কোন বিষয় না। তাই কবির ভাষায় বলতে হয়- 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার?'

বর্তমান নারীরা বিভিন্নভাবে যে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তা থেকে পরিত্রাণের প্রধানতম উপায় হচ্ছে নারীশিক্ষা। নারীসমাজ শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে একজন আত্মনির্ভরশীল ও পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। নিজের মেধা, বুদ্ধি, শিক্ষা, শক্তি, সাহস দিয়ে জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং এক একটি সম্পদরূপে গণ্য হতে পারে দেশের জন্য। একুশ শতক যুক্তি, বিজ্ঞান; মনন ও বিশ্বমানব মৈত্রীর শতক। এই শতক গণতন্ত্র, অগ্রগতি ও প্রগতির শতক। পরিভোগ প্রবণ সমাজে নারী যেন নিছক পণ্যে পরিণত না হয়, সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে নারীসমাজকে। যুগ যুগ ধরে যে নারী চোখের জলের কোন মর্যাদা পায়নি, যে নারী ব্যবহৃত হয়েছে অন্তঃপুরের খেলার পুতুল হিসেবে, আধুনিক সমাজে সে নারীকে দাঁড়াতে হবে শিক্ষিত, মার্জিত, আলোকিত মানুষ হিসেবে। তাই মেয়েদের প্রতি উদাসীন না হয়ে অভিভাবকদের উচিত, উচ্চশিক্ষা প্রদানে তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিষয় নির্ধারণ এবং যোগ্যতা প্রমাণের পূর্ণ সুযোগ দেয়া।